GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE,CHAPRA

STUDY MATERIAL FOR BENGALI HONS/GE/GENERAL SEMESTER- 1 (2022-23)

COURSE CODE- BNG-H-CC-T-1/ BNG-H-GE-T-1/BNG-G-CC-T-1

COURSE TITLE- HISTORY OF BENGALI LITERATURE (ANCIENT AND MEDIEVAL)

CHAPTER-3 (পর্ব -৩/পর্ব-১/পর্ব-১) History of Bengali Literature (Medieval Literature)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (মধ্যযুগ)

TOPIC- MONGALKABYA O CHANDIMANGAL KABYA EBANG KABIKANKAN MUKUNDARAM CHAKRABARTY

আলোচিত বিষয়ঃ (মঙ্গলকাব্য ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য এবং কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী)

ড. লতিফ উদ্দীন

সহকারী অধ্যাপক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

আলোচনাকে পাঠক্রম অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক করে তুলতে পাঠক্রমে যেভাবে বিষয় বিন্যাস করা হয়েছে আমরা সেইভাবেই এখানে পরপর বিভিন্ন অংশকে আলচনায় নিয়ে আসব ।

মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও বিবর্তন এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যঃ পঞ্চদশ শতকে থেকে মঙ্গলকাব্যগুলি যখন লেখা হয়েছিল তখন সেই সচেতনতা কবিদের মধ্যে ছিলনা যে এটি বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারার সাহিত্যকর্ম।আমরা সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনায় একে একটি স্বতন্ত্র ধারায় ফেলেছি । কিন্তু এটাও ঠিক সাহিত্য রচনার একটা ছাঁচ তৈরি হলে কবিরা যখন সচেতন ভাবে তা অনুসরণ করেন তখন তা একটি বিশেষ ধারার জন্ম দেয় যেমন অনুবাদ কাব্য যেমন পদাবলী ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন কেন এই বিশেষ ধারার সাহিত্য কর্মের সূচনা হল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে। এই আলোচনায় সর্বাগ্রে যে কথাটা বলতে হয় তা হল সাহিত্য রচনার পিছনে সময়ের দাবিকে উপেক্ষা করা যায়না কোনোভাবেই। অর্থাৎ সমসামিক মানুষের মানসিক চাহিদার প্রতিফলন সাহিত্যে ঘটে। মধ্যযুগের ক্ষেত্রে এই মানসিক চাহিদা বা ক্ষিদে অনেকক্ষেত্রেই জনমানসের না হয়ে কোনো একজন মানুষের হয়েছে সহজ করে বলতে গেলে রাজার বা সামন্ত প্রভুর। মজার কথাটা হল আধুনিক যুগেও যেখানে সাহিত্যের নিয়ন্ত্রক রূপে শাসকের ভূমিকা সমালোচনার ক্ষেত্র তৈরি করছে সেখানে মধ্যযুগের শাসকেরা উদারতা দেখিয়েছেন। আমরা দেখব প্রচীন যুগে চর্যাপদের কবিরাও শাসকের রোষ থেকে বাঁচতে নেপালে তিব্বতে আশ্রয়

নিয়েছেন, সাহিত্য হয়েছে রূপকধর্মী। সেদিক থেকে মধ্যযুগের শাসকদের প্রশংসাই করতে হয়। প্রথম মঙ্গলকাব্য মনসামঙ্গলের পালাকার বিজয়গুপ্ত তাঁর পদ্মা পুরাণে সুলতান হুসেন শাহকে সম্মান জানিয়েছেন। এখানে কেউ বলতে পারেন চণ্ডীমঙ্গলের পালাকার মুকুন্দ চক্রবর্তীকেও তো দেশ ত্যাগ করতে হয়েছিল । একথা ঠিক কবিকে তাঁর জন্মভিটা ত্যাগ করতে হয়েছিল কিন্তু তার পিছনে রাজনৈতিক কারণ ছিল। তাঁর সাহিত্য রচনা এর জন্য কোনো অংশে দায়ি নয়। আমরা আলোচনার পরবর্তী ধাপে এর উপর আলোকপাত করব।

এই আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি মধ্যযুগের শাসকরা সরাসরি সাহিত্যকর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, রাজসভার কবি কথাটা অবশ্য তার আগে থেকেই আমরা পাই। কবিকঙ্কনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জমিদার বাঁকুড়া রায় ও তার পুত্র রঘুনাথ রায়। ভুলে গেলে চলবে না সাহিত্য ছিল বিনোদনেরও একটা মাধ্যম। আর সেই কবে থেকেই তো বাঙালি তার সমাজ ও জীবনকে ভাষায় প্রকাশ করতে চেয়েছে শুনতে চেয়েছে এর মধ্যেই শুষে নিতে চেয়েছে জীবনরস। কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়,সদুক্তিকর্ণামৃত,প্রাকৃতপৈঙ্গলে সেই নিদর্শন আমরা পেয়েছি। মঙ্গলকাব্যও ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্য হলেও সমকালীন সমাজ জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে বেশ জোরের সঙ্গেই। বলাবাহুল্য মাত্র এই সমস্ত সাধারণ কারণগুলির আলোকেই আমরা মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভবের পিছনে আরো গভীর কারণগুলির অনুসন্ধান করব সমকালীন সমাজ ইতিহাস রাজনীতি ধর্ম লোকজীবনের অন্দরে প্রবেশ করে ।

মঙ্গল দেবদেবী ও কাব্যের উৎসমুখ অনুসন্ধানে আমরা ফিরে যাব রাজধানীর অদূরে বয়ে চলা চিরন্তন গ্রামজীবনে। বাংলার গ্রামজীবনে সাধারণ মানুষ তাদের জীবনের চাওয়া পাওয়া ভয় ভীতি থেকে মুক্তি পেতে বিভিন্ন ব্রত পালন করে এসেছে বহুকাল থেকে। পুণ্যপুকুর ব্রত,ইতু ব্রত ইত্যাদি বিভিন্ন ব্রত পালনের সঙ্গে ছড়া ,গল্প বলার চল ছিল। মঙ্গল দেবীদের তুষ্ট করার পিছনেও লোকজীবনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন চাওয়া পাওয়া ভয় ভীতি কাজ করেছে। হয়ত ব্রতের এই রীতি থেকেই মঙ্গলাব্যের দেবতা-দেবীদের নিয়ে গান রচনার সূচনা হয়েছে। এর সঙ্গে ধর্মীয় ও সামাজিক সমন্বয়ের একটা ক্ষেত্রও আছে। আর্য অনার্য তথা লোক জীবন ও পৌরাণিক ভাবধারার বা সংস্কৃতির সমন্বয়ের সূচনা তুর্কী আক্রমণের অনেক আগেই শুরু হয়েছিল এদেশে। তুর্কী আক্রমণের পর পরিবর্তিত সামাজিক কাঠামোয় নিজেদের মধ্যকার বিছিন্নতাকে দূর করতে তা আরো দ্রুত হয়ে পড়ল হিন্দু সমাজে। সেই কারণেই ব্যাধ-জাতির আরাধ্যা দেবী বা ‘যোষিতামিষ্ট দেবতা’ চণ্ডী সহজেই মিশে গিয়েছেন শিবপত্নী পাবর্তীর সঙ্গে।আর মঙ্গলকাব্যগুলিতে তো এটাই দেখি সমাজের উচ্চকোটিতে স্থান লাভের বাসনা লৌকিক দেবমণ্ডলের। দেবী চন্ডী কেবল ব্যাধ কালকেতুর পূজো পেয়ে সন্তুষ্ট নন বণিক ধনপতির পূজাও তার চায়। মনসামঙ্গলেও একই গল্প।

প্রসঙ্গত ড.সুকুমার সেনের একটা উক্তির স্মরণ নিতে হয় “ চন্ডীমঙ্গলের অধিদেবতা দুর্গা অরণ্যানী বা বিন্ধ্যবাসিনী,তবে তিনি চণ্ডমুণ্ডমহিষসুরবিনাশিনী নহেন; তিনি অভয়া।তাই প্রচীন চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতারা তাঁদের কাব্যকে বেশির ভাগ অভয়ামঙ্গলই বলিয়াছেন।”

তিনি এই অভয়া বনদেবীর অস্তিত্ব যে আর্যমণ্ডলে ছিল তা ঋকবেদের দশম মণ্ডলে উল্লেখিত একটি স্তব থেকে দেখিয়েছেন। তিনি দুর্গার দুই রূপভেদের কথা বলেছেন তা হল মহিষাসুর, শুম্ভনিশুম্ভ বধ কারিনী এবং বিন্ধ্যবাসিনী দেবী। দুই রূপেরই নামান্তর হয়েছে চন্ডী নামে-

“ প্রথম দুর্গার বেলায় চণ্ডবিনাশিনী বলিয়া চণ্ডী নাম খুবই সার্থক। দ্বিতীয় দুর্গা অভয়া ও জীবধাত্রী বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল মঙ্গলচণ্ডী বা অভয়া দুর্গা। চন্ডীমঙ্গল পাঁচালীতে ইহাই দেবীর বিশিষ্ট নাম।” তাঁর আলোচনার সূত্র থেকে যেটা পাওয়া যায় তা হল দুর্গা-অভয়ার পূজার সঙ্গে দুর্গা-চন্ডীর পূজার মিশ্রণ ঘটেছিল।আবার মেয়েদের ব্রত কথায় বনদেবীর লৌকিক রূপের পূজা প্রচলিত ছিল। চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধ খণ্ডে তাই অভয়া দেবী যেমন আছে তেমনি বণিক খণ্ডে খুল্লনা পূজিত ব্রত কথার হারানো পাওয়ার দেবী রূপেও আছেন। চণ্ডীমঙ্গলের আখ্যানের মধ্যেই মঙ্গল দেবীর বিবর্তনের রূপরেখাটি চিহ্নিত হয়ে আছে।

আলোচনার সূচনাতে বলেছিলাম সাহিত্য সৃষ্টির অনুঘটক রূপে সময় এবং মানুষের চাহিদার কথা। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য তথা মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রেও দেখি সময়ের বড় ভূমিকা কাজ করেছে। চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকের মুসলমান শাসনের প্রারম্ভে সমাজে একটা সমন্বয় চলছিল। সমাজের উপরের অংশই এই সমন্বয়ে অধিক আগ্রহী ছিল বলেই মনে হয়। কারণ সমাজের নীচু তলার মানুষ নিজেদের অভাব অভিযোগ ও চাওয়া পাওয়া মেটাতে লৌকিক দেবদেবীর উপর ভরসা রাখল যারা ভক্তের জন্য সব কিছু করতে পারে। যারা ন্যায় অন্যায়ের ধার ধারেনা। পৌরাণিক দেবদেবীদের উপর কি তারা আস্থা হারিয়েছিল? সেই কারণেই সামাজিক ভাঙন রোধ করতেই পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে লৌকিক দেবতার সমন্বয় ঘটল। সেই সঙ্গে লোক সাহিত্যের সঙ্গে রাজসভার ও নাগরিক সাহিত্যের সংমিশ্রণ ঘটল । ফলত যা ছিল লোকজীবনের সামগ্রী তা সর্বজনীন হয়ে উঠল সামাজিক-ধর্মীয় প্রয়োজনে। জনমানসের তৎকালীন চাহিদা এর প্রসার ঘটাতে সাহায্য করল। মধ্যযুগের সাহিত্য ধারায় সৃষ্টি হল মঙ্গলকাব্যের ধারা।

মঙ্গলকাব্যের সংজ্ঞাঃ চর্তুদশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে পাঁচালি রীতিতে মূলত পয়ার ছন্দে লৌকিক দেবদেবীর বন্দনা বা পূজোর প্রচারমূলক একপ্রকার কাহিনিকাব্য প্রচলিত হয় যা পালাগানের আকারে(দিবা পালা ও নিশা পালা,আট দিনে ষোল পালা) এক মঙ্গলবারে শুরু হয়ে পরের মঙ্গলবারে শেষ হতো।

কাব্যের নাম মঙ্গল হওয়ার পিছনে অনেক কারণ থাকলেও মানুষের মঙ্গল কামনা তথা এই কাব্য পাঠ করা, শোনা বা রচনার মধ্যে সার্বিক মঙ্গল হওয়ার যে কথা আছে তা প্রধান্য পেয়ছে।

সর্পদেবী মনসার পূজা প্রচারমূলক কাব্য মনসামঙ্গলের মধ্য দিয়ে এই কাব্যের সূচনা।

বৈশিষ্ট্যঃ মঙ্গলকাব্যগুলির গঠনগত বিন্যাস একে অন্য যেকোনো কাব্যের থেকে আলাদা করে তুলেছে। আমরা সেই আলোচনায় আসব তার আগে এই বেশ কিছু নিজস্বতা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত এই কাব্য দেবদেবীর পূজা প্রচারমূলক কাব্য এটা যেমন আসবে তার থেকেও বেশি মূল্য পাবে এই দেবতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মঙ্গলদেবদেবীরা স্বভাবগত দিক থেকে বেশ আগ্রাসী,কোপন স্বভাব বিশিষ্ট। ভক্তের ইচ্ছাপূরণে তারা সব কিছু করতে পারে। মানুষের মতোই তাদের আচরণ।

দ্বিতীয়ত এই কাব্য কাহিনিকাব্য হলেও গেয়। অর্থাৎ পালাগানের আকারে কাব্যটি রচনা করা হতো। রাগরাগিনীর ব্যবহার হত। যে কবি হাতে বা পায়ে ঘুঙুর পরে গান করত তাকেই কবিকঙ্কন বলা হত।

তৃতীয়ত এই কাব্য দেবতার বন্দনগীতি হলেও এখানে মানুষই প্রধান। মানব জীবনচর্যা, সমাজ,সুখ দুঃখ হসি কান্না সহজ স্রোত প্রবাহিত হয়েছে সমগ্র কাব্য জুড়ে।

কাব্যের গঠনগত বিন্যাসে আমরা দেখব প্রতিটি মঙ্গলকাব্য শুরু হয় বন্দনাখণ্ড দিয়ে।এই খণ্ডে গনেশ,সূর্য,সরস্বতী,মহাদেব প্রভৃতি দেবদেবীর বন্দনা করে কাব্য শুরু করা হয়।

এই অংশেই কবিরা আত্মপরিচয় দেন এবং দেবীর স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে গ্রন্থ-উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করেন।

পরবর্তী খণ্ডের নাম দেবখণ্ড। যেহেতু পূজা প্রচার দেবতার কৃপা লাভের জন্য এই কাব্য তাই দেবখণ্ডে দেবতার মাহাত্ম্যগান করা হয়। এখানে সৃষ্টিরহস্য, হরগৌরীর কাহিনি প্রধান স্থান

পায়। এই খন্ডেই যে দেবতার পূজো প্রচারের এই কাব্য মর্ত্যধামে তার পূজোপত্তনের জন্য স্বর্গের কোন দেবতাকে অভিশাপ দিয়ে মর্ত্যে পাঠানো হয়।

দেবখণ্ডের পরে আসে নরখণ্ড । এখানে শাপগ্রস্ত দেবতারা মর্ত্যে জন্ম নেবার পর বহু বাধা বিপত্তির পর তাদের মাধ্যমে ধরাধামে মঙ্গলকাব্যের উদ্দিষ্ট দেবতার পূজা প্রচলিত হয়।

গ্রন্থ শেষে বা শেষ পালায় থাকে অষ্টমঙ্গলা। কাহিনির সংক্ষিপ্তসার।

এছাড়া প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই নারীগণের পতিনিন্দা,বারমাসের দুঃখ বর্ণনা, বিশ্বকর্মা কর্তৃক পুরী নির্মাণ, চৌতিশাস্তব, কাঁচুলী নির্মাণ প্রভৃতি স্থান পায়।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনিঃ চণ্ডীমঙ্গলের নরখণ্ডে দুটি কাহিনি আছে একটি আক্ষটি খণ্ড অন্যটি বণিক খণ্ড। আক্ষটি খণ্ডে ব্যাধ কালকেতুর কথা আছে, কালকেতু ও তার স্ত্রী ফুল্লরা আসলে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর ও তার স্ত্রী ছায়া। শাপগ্রস্ত নীলাম্বর মর্ত্যে ব্যধের ঘরে জন্ম নিয়ে দেবীর পূজোর প্রচলন করে আবার সস্ত্রীক স্বর্গে ফিরে যাবে। কাহিনির মধ্যে দেখানো হয়েছে কিভাবে সামান্য ব্যাধ দেবীর কৃপায় বন কেটে রাজ্যগঠন করলেন।অর্থাৎ দেবীর কৃপায় ফকিরও রাজা হতে পারে। কালকেতুর জীবনে আসা সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে হেলায় সরিয়ে দেবী তাকে প্রতিষ্ঠা দিলেন। তেমনি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কালকেতুও মর্ত্যে দেবীর পূজোর প্রচলন করল। এই কাহিনিতে দেবী অভয়া,তিনি পশুমাতা,শিকারের দেবী।

পরবর্তী খণ্ড বণিকখণ্ডের কাহিনি মনসামঙ্গলের মতো। প্রথম খণ্ডে ব্যাধের ঘরে দেবী প্রতিষ্ঠা পেলেন কিন্তু তখন সমাজের মাথায় ছিল বণিক শ্রেণি তাদের মধ্যেও দেবীর পূজা চায় সেইকারণেই বণিকখণ্ডে ধনপতির মাধ্যমে দেবীর পূজোর ব্যবস্থা হল। এই কাহিনিতে স্বর্গের নর্তকী রত্নমালা অভিশপ্ত হয়ে মর্ত্যে খুল্লনা রূপে জন্ম নেয়। প্রথম স্ত্রী লহনার সন্তান না হওয়ায় ধনপতি তারই খুড়তুতো বোন খুল্লনাকে বিয়ে করেন। বণিক বাণিজ্যে গেলে দাসী দুর্বলার মন্ত্রণায় লহনা খুল্লনার উপর নির্যাতন করলে খুল্লনা দেবীর কৃপায় রক্ষা পায়। কিন্তু শিব উপাসক ধনপতি দেবীর পূজা বন্ধ করে দেয়। পরিণামে বাণিজ্য যাত্রায় দুর্ভোগ এবং সিংহল রাজার হাতে বন্দী হতে হয়। বহুদিন পর দেবীর কৃপাধন্য পুত্র শ্রীমন্ত তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে পিতা ও পুত্রের মিলন হয়। স্বদেশে ধনপতি পরমভক্তি ভরে দেবীর পূজো করে, মর্ত্যের উচ্চ সমাজে দেবী চণ্ডীর পূজোর প্রচলন হয়।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীঃ মধ্যযুগের অন্য কবিদের থেকে মুকুন্দরাম অনেকটাই ভিন্ন সেটা তাঁর লেখনীর জন্য যতটা ততটাই তার উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে। সাহিত্যিকের বড় গুণ যে নৈর্ব্যক্তিকতা তা তার সাহিত্যের বড় দিক । মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যে নতুন কি আর থাকতে পারে যার জন্য তাকে আমরা অতি আধুনিক যুগেও আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসি। সেটা তার জীবনভাবনা মানুষের প্রতি প্রসন্নচিত্ততা।মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, সাহিত্যিকের যে দর্শন তাকে স্রষ্টার আসন দেয় তা কবিকঙ্কনের ছিল। রাজনৈতিক পালাবদলের(পাঠান-মোগল সংঘর্ষ) এমন একটা সময়ে তিনি লিখছেন যখন তাকেও অত্যাচারিত হয়ে ভিটা ছাড়া হতে হয়েছে। তিনি লিখলেন সেই সমস্ত বিবরণ কিন্তু কোথাও ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশ পেলনা। অদ্ভুত ক্ষমা সুন্দর একটা দৃষ্টি যা তাকে যুগের মধ্যে রেখেও যুগকে অতিক্রম করতে বড় ভূমিকা নিল। নরখণ্ডের ‘পশুগণের ক্রন্দন’ অংশের কথা প্রসঙ্গত চলে আসে, কালকাতুর বাণের আঘতে ক্রমাগত পশুদের প্রাণ যাচ্ছে,পশুরা সবাই মিলে দেবীর কাছে এসেছে বিচারের আসায় - ভালুকের জবানীতে মুকুন্দরাম লিখলেন-

“উইচারা খাই আমি নামেতে ভালুক / নেউগী চৌধুরী নই না করি তালুক।।” অসহায় নিপীড়িত মানুষের এটাই তো চিরকালীন জিজ্ঞাসা। সহজ কথায় তিনি ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে ঘর ছাড়লেও অত্যাচারীর ধর্মীয় পরিচয় তার কাছে বড় হয়নি। সেই কারণেই আমরা দেখি দেবীর

কৃপায় কালকেতু যখন রাজা হলেন গুজরাট নগর পত্তন করলেন তখন মুকুন্দরাম সেই কল্পিত নগরীতে মুসলমানদেরও স্থান দিলেন সম্মানের সঙ্গে। শুধু তাই নয় তাঁর বর্ণনায় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে উঠে এল মুসলমান সমাজের খঁটিনাটি অনেককিছুই, উঠে এসেছে শিশুদের পাঠশালায় পড়ার কাথা- "যত শিশু মুসলমান/ তুলিল দলিজ খান/ মখদম পড়ান পাড়না।"

মুকুন্দরামের স্বন্ত্রতা বিশ্লেষণ সহজ হয়ে যাবে যদি আমরা মধ্যযুগের অপর বিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্রেকে এই আলোচনায় নিয়ে আসি। দুজন কবি দুরকম ভাবে সমাজকে দেখেছেন। ভারতচন্দ্রের ছিল তীব্র ব্যাঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী যাকে আমরা স্যাটায়ার বলি তাই। নাগরিক বুদ্ধিদীপ্ততাকে হাতিয়ার করে তিনি উইট ও স্যাটায়ারের জাল বুনেছেন।বাঁকা হাসির ছটা আছড়ে পড়েছে সমাজের সর্বত্র। নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়- এ কথা ভারতচন্দ্রই বলতে পারেন। মুকুন্দরামের পথ ভিন্ন তিনি হিউমারের সৃষ্টি করেছেন। নির্মল শুভ্র হাস্যরসের ছোঁয়া লেগেছে কাব্যের সর্বত্র। গুজরাট নগরে আসা মানুষের কথা বলতে গিয়ে কী অনায়াসে তিনি বলেন-

" গুজরাটে বৈদ্যজন ফিরে

কার দেখে সাধ্য রোগ ঔষধ করয়ে যোগ

বুকে ঘা মারিয়া অর্থ চায়।

অসাধ্য দেখিয়া রোগ পলাইতে করে যোগ

নানা ছলে করয়ে বিদায়।"

মুকুন্দরাম সম্পর্কে আলোচনায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তিকে উল্লেখ করতেই হয় " দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তার মধ্যে বর্তমান ছিল। এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি একজন কবি না ঔপন্যাসিক তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।" আমরা এই আলোচনায় আসব তার আগে কবি সম্পর্কে কয়েকটি জিজ্ঞাসা নিয়ে আলোচনায় আসব। প্রথমত কবির নাম অনেকেই অধুনা প্রাপ্ত পুঁথি অনুসারে মুকুন্দ চক্রবর্তী বলেছেন। অর্থাৎ রামের অবলুপ্তির কথা বলেছেন । এই বিষয়ে সুখময় মুখোপাধ্যায়ের কথাকে মান্যতা দিয়ে বলতে হয় একে তো মুকুন্দরাম চক্রবর্তী নামে তিনি বহুল পরিচিত তাছাড়া নামের মধ্যেকার অংশ যেমন কুমার ইত্যাদি বাদ দিয়ে লেখার চল আছে তাই বলে কুমার অবলুপ্ত হয়ে যায় না।

মাকুন্দরামের কাব্য রচনা কাল নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। তিনি কাব্যে মানসিংহের উল্লেখ করেছেন যিনি বাংলার সুবেদার ছিলেন ১৫৯৪ থেকে ১৬০৫ সাল পর্যন্ত। তার সময়ে কি ডিহিদার ছিলেন মামুদ শরিফ? কিন্তু ১৮২৩ সালে রামজয় বিদ্যাসাগরের সংস্করণে কাল নির্দেশক শ্লোক অনুসারে কাব্য রচনাকাল ১৫৪৪ অথবা ১৫৭৭ –

"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা

কত দিনে দিলা গীত হরের বণিতা।"

আবার কবি বর্ধমানের দামিন্যা ছেড়ে মেদিনীপুরের বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে উপস্থিত হলেন , রাজপুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত হলেন এবং শিষ্য রঘুনাথের সময়ে তার কাব্য রচনা। এই রঘুনাথের রাজত্বকাল ১৫৭৩ থেকে ১৬০৪ সাল। কোনো কোনো মতে তিনি ১৫৪৪ সালে গৃহ ত্যাগ করলেও স্বপ্নাদেশ লাভের বহু পরে কাব্যরচনা করেন। কিন্তু এটা নিয়েও বিতর্ক আছে।

রচনাকাল নিয়ে বির্তক থাকলেও মুকুন্দরামের প্রতিভা নিয়ে কোনো বির্তক নেই। এ যুগে জন্মালে তিনি সত্যিই ঔপন্যাসিক হতেন। জীবন অভিজ্ঞতা,নিপুণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, বাস্ততাবোধ, দর্শন, কাহিনি বিন্যাস সবেতেই তিনি আধুনিক ঔপন্যাসিক সুলভ প্রতিভার অধিকারী। এ যুগের অন্যতম সাহিত্যের ইতিহাসকার অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মুকুন্দরামকে মধ্যযুগের ইংরেজ কবি

চসার ও ক্র্যাবের সঙ্গে তুলনায় এনেছেন। মুকুন্দরাম এদের সমপর্যায়ে না পড়লেও খুব একটা পিছিয়েও নেই। প্রাচ্য সাহিত্যরসিক ই.বি.কাউয়েল এ বিষয়ে লিখেছেন-

“ It is this vivid realism which gives such a permanent value to the description. Our author is the crabbe among Indian poets and his work thus occupies a place which is entirely its won.”

সবচেয়ে বড় মুকুন্দরামের চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতা। এ বিষয়ে আলোচনায় আমার অন্তত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ে। বিভুতিভূষণের উপন্যাসে যেমন আমরা অজস্র চরিত্র পাই এবং তারা প্রত্যেকেই অন্যদের থেকে আলাদা মুকুন্দরামেও তাই।

মুকুন্দরাম ব্যাধ কালকেতুকে ব্যধের মতোই গড়েছেন। অতি শক্তিশালী আহারের কোনো মার্জিত ভাব নেই,সরল এতটাই যে তা বোকামির পর্যায়ে পড়ে। কালকেতু তাই ধনপ্রদায়ী দেবীকেও সন্দেহ করে যে দেবী তাকে দেওয়া ধন নিয়ে না পালায়-

“পশ্চাতে চন্ডিকা যান আগে কালু যায়।

ফিরি ফিরি কালকেতু পাছুপানে চায়।।”

এ হেন কালকাতুকে তাই শঠ ভাঁড়ু দত্ত সহজেই বোকা বানাতে পারে। কিন্তু এ সব নিয়েই তো কালকেতু তাকে বণিক ধনপতির সঙ্গে এক করা যায় না । ধনপতি সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্র। সে বিলাসী ,কৌতুক প্রিয়।মুকুন্দরামের নারী চরিত্রগুলি অধিক উজ্জ্বল। ফুল্লরা প্রকতই ব্যাধ পত্নী হয়ে উঠেছে তার সঙ্গে লহনা এবং খুল্লনার তুলনা চলে না। কপট দাসী দুর্বলাও নিজস্ব বৈশিষ্টে উজ্জ্বল। তবে মুকুন্দরামের চরিত্রগুলোর মধ্যে ভাঁড়ু দত্ত ও মুরারি শীল চিরজীবী। বাকচতুর ভাঁড়ুর শঠতার মধ্যেও কোথাও যেন কৌতুক লুকিয়ে আছে যে কারণে সে পাঠকের সমর্থন পায়। আবার স্যাকরা মুরারি শঠ হলেও সে ভাঁড়ু দত্ত নয়। কালকেতু দেবীর কাছ থেকে পাওয়া সোনার আংটি তার কাছে বিক্রী করতে এলে সে ঠকানোর জন্য যে কথা বলে তা প্রবাদে পরিণত হয়েছে-

“ সোনারূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।

ঘষিয়া মাজিয়া বাপু কর্যাছ উজ্জ্বল।”

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থসমূহঃ

১। কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল, সৌমেন্দ্রনাথ সরকার, গ্রন্থবিকাশ, কোলকাতা-৭৩

২। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম,সুখময় মুখোপাধ্যায়,ভারতী বুক স্টল,কোল-০৭

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,সুকুমার সেন,আনন্দ,কোল-০৪

৪। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত(দ্বিতীয় খণ্ড),অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,মর্ডার্ণ বুক এজেন্সী,কোল-৭৩

৫।বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস,ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থনিলয়,কোল-০৯

৬। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য,দীনেশচন্দ্র সেন,পঃবঃ রাঃ পুস্তক পর্ষৎ,কোল-১৩

৭।সাহিত্য-টীকা,শ্রীসনৎকুমার মিত্র,পুস্তক বিপণি,কোল-০৯

প্রয়োজনীয় প্রশ্নাবলীঃ

১। মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও বিবর্তন সম্পর্কে বিশদে/সংক্ষেপে লেখো।(৫/১০)

২.মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের উৎস ও প্রকৃতির ধারণা দাও।(৫)

৩।মঙ্গলকাব্যের সজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশদে/সংক্ষেপে আলোচনা করো। (৫/১০)

৪। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনির বিশিষ্টতা কী ? (৫/১০)

৫। মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র তুলনামূলক আলোচনা করো।(৫/১০)

৬।চণ্ডীমঙ্গলের চরিত্রসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করো।(১০)

৭। মুকুন্দরামের কবি প্রতিভা বিচার করো। (১০)

৮।মুকুন্দরামের কাব্যে বাস্তবতা ও সমকালীন সমাজের যে ছবি আছে তার উল্লেখ করো।(১০)

৯।মুকুন্দরামকে কি ঔপন্যাসিক বলা যায়? বিস্তারিত আলোচনা করো।